॥ ৪ ॥

বিদ্যাপতি

[ক]

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হয়েও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। *চৈতন্যচরিতামৃত*-র সাক্ষ্যে আমরা জানি বিদ্যাপতির পদ চৈতন্যদেবের আস্বাদন-ধন্য হয়েছিল। সে যুগে মিথিলা এবং বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ব্যাপকভাবেই চলত বলে 'মৈথিল-কোকিল' বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলা দেশেও খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এর মধ্যে আবার বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী মিথিলার তুলনায় বাংলা দেশেই বেশি পরিমাণে আদৃত হয়েছে। বাংলাদেশে রচিত কাব্য *গীতগোবিন্দ* থেকে ঋণ গ্রহণ করে বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের কাছ থেকে 'অভিনব জয়দেব' উপাধি লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে, চৈতন্যোত্তর পদাবলী-সাহিত্যেও নানাভাবে বিদ্যাপতির প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির মণ্ডনমাধুর্যকে আত্মসাৎ করে নিজেই 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' উপাধি ধারণ করেছেন। তাই বিদ্যাপতি বাংলা দেশের অধিবাসী না হলেও বাঙালির নিজস্ব কবি। মিথিলায় তার শিব-বিষয়ক পদেরই সমাদর বেশি। মহাজনপদ হিসেবে বিদ্যাপতির পদাবলী *ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু* প্রভৃতি বৈষ্ণব পদসংকলনে স্থান পেয়েছে এবং এর ফলে বাঙালির রস-চৈতন্যে ঘটেছে তার শাশ্বত প্রতিষ্ঠা। হয়তো এই কারণেই বিদ্যাপতির জীবনী সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার আগে বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ তাঁকে বিশুদ্ধ বাঙালি কবি হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম তাঁর 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধে অন্যান্য বৈষ্ণবকবিদের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদও উদ্ধৃত করেন। ১৮৭২

Scanned with CamScanner

খ্রিস্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার ইতিহাস গ্রন্থেও বিদ্যাপতিকে অবাঙালি বলা হয়নি। কিন্তু ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন-এ 'বিদ্যাপতি' নামক প্রবন্ধে বিদ্যাপতির প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করেন। গ্রীয়র্সন সাহেব ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar* নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতির বিরাশিটি পদ সংকলন করেন। পরে বিদ্যাপতি সম্পর্কে আরও অনেক নতুন তথ্য জানা যায়।

মিথিলার দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনী মহকুমার বিসফী গ্রামে বিদ্যাপতি জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষদের অনেকেই মিথিলা-রাজসভার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বিদ্যাপতিও বেশ কয়েকজন রাজার রাজত্বকালে মিথিলার রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। কিন্তু রাজসভায় বসে তিনি শুধু রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ এবং শিব-গীতই রচনা করেননি, তিনি একাধারে পণ্ডিত, সভাসদ, রাজকর্মচারী, সেনাপতি এবং সংস্কৃত ও মৈথিল ভাষার নানা গ্রন্থের গ্রন্থকার ছিলেন। কীর্তিসিংহ থেকে ভৈরবসিংহ পর্যন্ত মোট ৮ জন রাজা ও একজন রাণীর পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেছিলেন। এর ফলে মিথিলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গ তাঁর দীর্ঘ পরমায়ুকে নানাভাবে আন্দোলিত করেছে। এর মধ্যে বিদ্যাপতির আবেগ-আনন্দময় রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদগুলি বেশিরভাগই রচিত হয়েছে শিবসিংহের রাজত্বকালে।

হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ ছাড়াও বিদ্যাপতি প্রকৃত-প্রেমলীলার কিছু পদ রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী ভারতীয় সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। গাথাসপ্তশতী, অমরুশতক, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারাষ্টক, শৃঙ্গারশতক প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত আদিরসের কবিতাসমূহ থেকেও বিদ্যাপতি ঋণ গ্রহণ করেছেন। হয়তো আদিরসাত্মক কবিতার এই ধারাই তাঁকে রাধাকৃষ্ণলীলাপর্যায় রচিত পদের শিল্প-সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল।

[খ]

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদের আলোচনা শুরু করতে হয় 'বয়ঃসন্ধি'-বিষয়ক পদগুলি দিয়ে। সংস্কৃত সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্রের উত্তরাধিকারী কবি বিদ্যাপতি তাঁর বয়ঃসন্ধির পদে নববিকশিত নারীদেহের অপূর্ব মধুরিমাকে ইন্দ্রিয়বিলাস হিসেবেই আস্বাদন করেছেন। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বিলাস নয়, কবি সেই সঙ্গে আরোপ করেছেন সৌন্দর্য-দৃষ্টিও। তাই বয়ঃসন্ধির পদে আমরা যে রাধাকে দেখতে পাই সেই রাধা, কৃষ্ণের মনের মাধুরী মেশানো লাবণ্য-প্রতিমা। কিছু কিছু সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোকে বয়ঃসন্ধি সময়ের নায়িকার দেহ-মনের ছবি রসোত্তীর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। বিদ্যাপতি এই সমস্ত কবিতার ধারা অনুসরণ করেও তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্য-দৃষ্টি এবং চিত্র রচনার কুশলতায় আগেকার সেইসব দৃষ্টান্তকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাপতির এই পর্যায়ের পদকে প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদও বলা যেতে পারে। কারণ বয়ঃসন্ধির রাধার সৌন্দর্য রূপলিপ্সু কৃষ্ণের চোখ দিয়েই বর্ণিত হয়েছে। কৈশোর আর যৌবনের মধ্যপথে থমকে দাঁড়ানো শ্রীরাধার দিকে শ্রীকৃষ্ণের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য দূতী বলে, রাধার সদ্যযুবতী শরীরে যে কিশোরী মনটি এখনো আছে, সে বালিকার খেলায় আনন্দ পায়। অন্যদিকে তার যুবতী সত্তার 'লোক দেখি লাজ' বড়ই মধুর। কৈশোর আর যৌবনের এই দ্বন্দ্ব

Scanned with CamScanner

উন্মথিত-চিত্ত তরুণী কখনো চুল বেঁধে রাখে, আবার কখনো খুলে ফেলে। কখনো দেহ আবৃত করে, আবার কখনো অভ্যাস না থাকায় পরমুহূর্তেই অনাবৃত করে। কৃষ্ণ নয়, রাজসভাসদ্ কবিই যেন সপ্রেম, সাকাঙ্ক্ষা-কৌতূহলে একটি বালিকার যুবতী হয়ে ওঠার স্তরান্তর লক্ষ করেছেন। তাঁর এই রাধা-কৃষ্ণ একটি বিশেষ কালের, বিশেষ পরিবেশের মানব-মানবী হয়েও নিত্যকালের রূপলিপ্সু প্রেমিক ও উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী। *সদুক্তিকর্ণামৃত*-এ রাজশেখরের একটি শ্লোকে উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'পদ্ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং।'[১] রাজশেখরকে অনুসরণ করে বিদ্যাপতি রচনা করলেন, 'চরণ চপলগতি লোচন লেল'। শতানন্দের একটি পদেও এই বয়ঃসন্ধির নায়িকার চমৎকার বর্ণনা আছে—

গতেবাল্যে চেতঃ কুসুমধনুষা সায়কহতং
ভয়াদ্বীক্ষবাস্যাঃ স্তনযুগভূন্নিজিগমিষু।
সকম্পা ভ্রুবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহরং
কৃশং মধ্যং ভুগ্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ॥[২]

বাল্যকাল গত হয়েছে, তাই চিত্ত কুসুমধনু মদনের দ্বারা তীরবিদ্ধ হয়েছে। তাই দেখেই যেন তার স্তনযুগ ভয়েই নির্গত বা নিষ্ক্রান্ত হতে ইচ্ছুক হয়েছে। ভয়ে ভ্রুবল্লী কম্পিত হচ্ছে। চোখ দু'টি কর্ণকুহরের দিকে চলেছে। মধ্যভাগ কৃশ হয়ে গিয়েছে। বলি বক্রতা লাভ করেছে। নিতম্বযুগল অবসন্ন হয়েছে। এর সঙ্গে বিদ্যাপতির 'সৈসব যৌবন দরসন ভেল', অথবা 'সৈসব যৌবন দুহু মিলি গেল' ইত্যাদি পদের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বিদ্যাপতি বয়ঃসন্ধির পদে শুধু রাধার শরীর নয়, মনেরও সূক্ষ্ম পরিবর্তনের একটি চমৎকার ছবি এঁকেছেন। সঙ্গীতমুগ্ধা হরিণীর মতো রাধা রসকথা অর্থাৎ নরনারীর প্রেমের কথা একাগ্র হয়ে শোনে—'সুনইতে রসকথা থাপয়ে চিত/যৈসে কুরঙ্গিনী সুনয়ে সঙ্গীত।' এই চিত্রটিতে কবি সদ্যযৌবনে সমাগতা বালিকার সঙ্গে অরণ্যচারিণী হরিণীর তুলনায় শুধু তার সারল্যকেই নিয়েছেন। নিষ্কলঙ্ক কৈশোরের পটভূমিতে এখনো প্রেমের বেদনা, হতাশা অথবা যন্ত্রণার ছায়াপাত ঘটেনি। রাধা শুধু এখানে অপরিজ্ঞাত প্রেমরহস্য সম্পর্কে আবেশময় মুগ্ধতার একটি ছবি, শৈশব ও তারুণ্যের সন্ধিস্থলে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় হৃদয় অরণ্যের প্রবেশপথে থমকে দাঁড়ানো উজ্জ্বল মানবী। কবি বালিকা ও তরুণী সত্তার দ্বন্দ্বের আভাসটুকু রাখলেও রসকথা মুগ্ধতায় তারুণ্যেরই অবিসংবাদী জয় ঘটেছে। এইভাবে কবি অনাড়ম্বর অথচ সুনির্বাচিত অলঙ্কারে মনস্তত্ত্বের একটি স্বাভাবিক সত্যকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার মধ্যে বাস্তব জীবনের ও রক্ত-মাংসের মানুষের উত্তাপ সঞ্চার করতে পেরেছেন। এই জীবনানুগামিতাই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ লীলাকথার প্রাণ।

পূর্ববর্তী কবি জয়দেবের কাব্যের রাধা প্রথম থেকেই পরিপূর্ণা যুবতী। তাঁর কোন পারিবারিক পরিবেশ নেই, নেই বালিকা থেকে নারী হয়ে ওঠার মানবিক অভিজ্ঞতা। বিদ্যাপতি আমাদের সামনে এক মুকুলিকা মানবীর অপূর্ব রূপচিত্র অঙ্কন করলেন। বিদ্যাপতিরই সমকালে বড়ু চণ্ডীদাসও বালিকা রাধার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সেখানে বালিকার শরীর ও মনের কমনীয় সৌন্দর্য পুরুষের উদগ্র দেহবুভুক্ষায় লাঞ্ছিত। অনিচ্ছুক বালিকা তীব্র দেহমিলনের ভেতর দিয়ে প্রেমের আনন্দ-যন্ত্রণাকে অনুভব করতে বাধ্য হয়েছে। তাই বয়ঃসন্ধির বয়সটুকু সেখানে আছে,

১. সদুক্তিকর্ণামৃত—২/২/৪
২. ঐ —২/২/৫

নেই তার বিকাশমান সৌন্দর্যের মুগ্ধ অনুভব। অন্যদিকে, বিদ্যাপতির কৃষ্ণ শুধু অনঙ্গশরজর্জর নন, তিনি সৌন্দর্যরসিকও। তিনি কামকলার বিদগ্ধ নায়ক। তাই কিছু মুগ্ধতা, কৌতূহলী ভালবাসা আর তীব্র মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি দেহে মনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা মানবীর জন্য সহিষ্ণু আগ্রহে অপেক্ষমান। পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের পর কৃষ্ণের সংশয়ের মধ্যে সেই সহিষ্ণুতার পরিচয় 'লখএ না পারিঅ জেঠ কনেঠ'। আর এই পর্যবেক্ষণেই প্রেমিকের চোখ দিয়ে দেখা নারী-লাবণ্যের শিল্পিত প্রকাশ। এইভাবে বিভিন্ন পদে বয়ঃসন্ধির রাধার রূপ-রূপান্তর কখনো সখী নিজে দেখে কৃষ্ণকে দেখাচ্ছেন ; আবার কখনো কৃষ্ণ নিজেই দেখছেন। এইভাবেই বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদ একদিকে রাধার কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার স্তর-পরম্পরাকে যেমন একদিকে ধরে রেখেছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষ্ণের পূর্বরাগ পর্যায়ের প্রাথমিক স্তরকেও মনস্তত্ত্ব সম্মতভাবেই কাব্যরূপায়িত করেছে।

[গ]

পরবর্তী পর্যায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের স্ফুটতর স্তর। চৈতন্য-পূর্ব এবং চৈতন্যোত্তর—দুই যুগেই পূর্বরাগ ও রূপানুরাগ পর্যায়ে বহু সার্থক পদ রচিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষ্ণরূপতন্ময়া বংশীস্বরাবিদ্ধা রাধার প্রেমব্যাকুলতার ছবি। চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসের পদে আমরা সেই রাধারই পরিচয় পাই। তাই এঁরা শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় এঁরা ততখানি উৎসাহী নন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয়। তবে শ্রীরাধার পূর্বরাগ ও অনুরাগের পদও বিদ্যাপতি রচনা করেছেন।

বয়ঃসন্ধির পরবর্তী পূর্বরাগ ও অনুরাগ পর্যায়ে দেখা যায় সদ্যযুবতী রাধার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ দূতীর মাধ্যমে রাধাকে প্রেম নিবেদন করলেও রাধা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ তাঁর মনে এখনো প্রেম জাগ্রত হয়নি। অন্যদিকে কৃষ্ণের রূপমুগ্ধতা ফুটে ওঠে সিক্তবসনা রাধার সৌন্দর্য বর্ণনায়—'তিতল বসন তনু লাগু/মুনিহক মানস মনমথ জাগু'। এ ধরনের নিছক অনঙ্গ-উদ্দীপক আরও কিছু পদ বিদ্যাপতি রচনা করেছেন। পদগুলিতে একদিকে রাধার প্রতি কৃষ্ণের নিছক রূপমুগ্ধতাজনিত লালসা ও রাধার প্রেম সম্পর্কে কৃষ্ণের সংশয়ের প্রকাশ ঘটেছে। স্নানান্তে রাধার রূপবর্ণনা সংবলিত বেশ কিছু পদ কবির আছে। এই পদগুলিতে কামনাতুর পুরুষের দৃষ্টিতে কামোদ্দীপক নারীদেহ দর্শনের বর্ণনা আছে। কখনো সদ্যস্নানের পর রাধার সিক্তচিকুরের জলধারা দেখে কৃষ্ণের মনে হয়েছে 'মেহ বরিখে জনু মোতিম হার'। কৃষ্ণের কামনা অনাবৃতভাবেই প্রকাশিত হয়েছে স্নানরতা দেহ-সৌন্দর্য বর্ণনার রাধার একটি পদে। স্নানান্তে রাধার সিক্তবসন থেকে নির্গলিত জলধারা দেখে কৃষ্ণের মনে হয়েছে এখন রাধা ওই সিক্ত বসন ত্যাগ করে অন্য একটি বসন পরিধান করবেন। সেই শোকেই সিক্তবসন যেন জলধারা ঝরিয়ে ক্রন্দন করছে। কখনো কৃষ্ণের রূপানুরাগ ও তাঁর প্রেমের তৃষ্ণাতুর অতৃপ্তি বিদ্যাপতির কাব্যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সাহায্যে প্রকাশিত হয়—"সজনি ভল কএ পেখল ন ভেল।/মেঘ-মাল সঁয় তড়িত-লতা জনি/হিরদেয় সেল দেঈ গেল।।" বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ তীব্র দীপ্তির সঙ্গে রাধার রূপের তুলনা একই সঙ্গে কৃষ্ণের সৌন্দর্যরস-রসিকতা ও তীব্র দেহনির্ভর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকেই রূপ দিয়েছে। এই পদগুলি শুধু পূর্বরাগ অথবা রূপানুরাগেরই নয়, সেই সঙ্গে রূপোল্লাসেরও বটে। যৌবনধন্য কবি রাজসভার বিদগ্ধ আদিরস-উপাসকদের সামনে রাধাকৃষ্ণের জবানীতে এক নাগরিকের প্রেমবিলাসকে অলঙ্কৃত আড়ম্বরে রূপায়িত করেছেন।

Scanned with CamScanner

আবার কখনো বিশিষ্ট অলঙ্কার ব্যবহারেই রূপমুগ্ধ কৃষ্ণের বর্ণনায় কবি যেন শুচিস্নিগ্ধ পূজামন্ত্রই উচ্চারণ করেছেন বলে মনে হয়। রাধার স্তনযুগ সম্পর্কে কবির কৃষ্ণ বলেন—'কাম কম্বুভরি কনক সম্ভু পরি/ঢারত সুরধনি-ধারা'। নারীদেহকে এইভাবে দেব-বিগ্রহে তথা শিব-বিগ্রহে পরিণত করার প্রবণতা বিদ্যাপতির পদে অন্যত্রও দেখা গেছে। তাঁর ধর্মীয় প্রবণতার ইঙ্গিতও এর মধ্যে লুকিয়ে আছে মনে হয়। পূর্বরাগ পর্যায়ে বিদ্যাপতির কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য হল, তিনি কামজর্জর হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর নায়কের মতো রাধার ওপর বল প্রয়োগের বাসনা যেমন তাঁর নেই, তেমনি নিজের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করে রাধাকে অভিভূত করার চেষ্টাও তাঁর নেই। তাঁর রক্ত-মাংসের শরীরের তীব্র কামনা যেমন সত্য, সেই কামনার সঙ্গে জড়িত সৌন্দর্যমুগ্ধতাও তেমনি সত্য। আর এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ পর্যায়ে বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠ।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ নিয়েও বিদ্যাপতি বেশ কিছু পদ রচনা করেছেন। তাঁর রাধার পূর্বরাগ ও অনুরাগ কখনো সাক্ষাৎদর্শনে, আবার কখনো বা স্বপ্নদর্শনে। রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের কখনো দেখা হয়েছে যমুনা তীরবর্তী সংকীর্ণ পথে, আবার কখনো বা জনাকীর্ণ নগরীর মধ্যে। কখনো রাধা স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখেন,—"নীল কলেবর পীতবসন/চন্দনতিলক ধবলা।/সামর মেঘ সৌদামিনী মণ্ডিত/তথিহি উদিত সসিকলা॥" কখনো বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণরূপ দেখার আনন্দে বিভোর হয়ে সখীকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন—'এ সখি পেখলি এক অপরূপ'। কিন্তু এই রাধা তো নাগরিকা নায়িকা। তাই অপরূপকে দেখার আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়ে যান না। সম্বৃত শিল্পকুশলতায়, অলঙ্কৃত চাতুর্যে তিনি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেন। রূপমুগ্ধা রাধা কৃষ্ণের পদনখকান্তি থেকে মাথার ময়ূরপুচ্ছের শোভাকে পর্যন্ত নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। এ যেন দেহ-সৌন্দর্যকে অপরূপত্ব দেওয়ার জন্য রূপসন্ধানী কবির প্রকৃতিলোক সন্ধান। এর অলঙ্কার হল রূপক, অতিশয়োক্তি। পদের শেষে রাধা বলেছেন— কৃষ্ণকে আবার দেখতে গিয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। প্রথমবার কিন্তু তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই কৃষ্ণরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন। রাধার এই সচেতন রূপাস্বাদন রাজঅন্তঃপুরের এক বিদগ্ধ নায়িকারই উপযুক্ত মানসধর্ম।

অমরুশতক-এর একটি বিখ্যাত শ্লোকের ভাবানুবাদে বিদ্যাপতি তাঁর অনুরাগবতী রাধার দেহকামনার তীব্র উল্লাসকে প্রকাশ করেছেন। শ্লোকটি হল—

> তদ্বক্ত্রাভিমুখং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পদয়োঃ
> তস্যালাপ কুতূহলাকুলতরে শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
> পানিভ্যাঞ্চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ স্বেদোদ্গমো গণ্ডয়োঃ
> সখ্যঃ কি করবাণি যান্তে শতধা রৎকঞ্চুকে সন্ধয়ঃ।[১]

এই শ্লোকটির অনুসরণে রচিত পদটি শিবসিংহের রাজত্বকালের। 'অবনত আনন কএ হাম রহলিহুঁ' শীর্ষক এই পদটিতে যৌবনধন্য কবির রূপোল্লাস ও রক্তমাংসের কামনার উত্তাপ যেন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এই পদেও রাধার পরিপূর্ণ যৌবনের তীব্র দেহচাঞ্চল্যের বর্ণনা। এই তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে কাঁচুলি ছিঁড়ে যাওয়া ও বলয় ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। পদটির অলঙ্কার ব্যবহারে কবি একদিকে প্রকাশ করেছেন রাধার অনুরাগের লজ্জা, অন্যদিকে প্রিয়রূপ দর্শনের আকুল অস্থিরতা। এইখানেই কবি অমরুর পদের তুলনায় বিদ্যাপতি নিজের স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করেছেন। 'নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী' শীর্ষক পদটিতে চতুরা রাধা সুকৌশলে কৃষ্ণকে দেখে নিয়েছেন। রাধা স্নান

১. *বিদ্যাপতির পদাবলী*—মিত্র মজুমদার সংস্করণ, পৃ. ২৯

করে উঠে সামনেই দেখতে পেয়েছেন কৃষ্ণকে। কিন্তু গুরুজনদের সামনে রাধা লজ্জায় নতমুখী। কী করে কৃষ্ণকে দেখবেন? রাধা তাঁর গলার মোতির মালা ছিঁড়ে ফেললেন। সবাই যখন মুক্তো কুড়োতে ব্যস্ত, তখন রাধা কৃষ্ণকে দেখে নিলেন। রাধার এই চাতুর্যও একজন অভিজাত নাগরিক নায়িকার। কিন্তু রাধার প্রেম কেবল চাতুরীসর্বস্বই নয়। অনুরাগ পর্যায়েই রাধা বলেন, কৃষ্ণ তাঁর হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, চোখের কাজল আর মুখের তাম্বুল। যে দর্পণে রাধার রূপ প্রতিবিম্বিত হয়, কৃষ্ণই যেন সেই দর্পণ। আবার রাধার প্রসাধন-ভূষণও কৃষ্ণ। এরপরই রাধা বলেন, কৃষ্ণ তাঁর 'দেহক সরবস গেহক সার'। দেহকে অস্বীকার নয়, দেহকে অঙ্গীকার করে নিয়েই রাধা এখানে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে কৃষ্ণকে জড়িয়ে নিয়েছেন। একইভাবে কৃষ্ণের অনুরাগের তীব্রতাও কবি বর্ণনা করেছেন। একটি পদে দেখা যায় দূতী রাধার কাছে বলছে— হরি বহু নারীর মধ্যে কেবলমাত্র রাধাকেই আকাঙ্ক্ষা করেন। স্বপ্নে রাধার নাম নিয়ে বারবার উঠে পড়েন এবং আলিঙ্গন দান করেন। আবার কখনো দূতী রাধার কাছে এসে রাধাপ্রেমোন্মত্ত কৃষ্ণের বর্ণনা দেন। কৃষ্ণ কখনো অকারণে হাসেন, কখনো গদ্গদভাবে কথা বলেন, কখনো আকুলভাবে হা ধিক, হা ধিক বলতে থাকেন। তাঁর দুর্বল দেহ কাঁপে—কেউই তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। এই বর্ণনা পরবর্তীকালীন ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর ছবিই আমাদের সামনে মেলে ধরে। বিদ্যাপতির এই পদের ভণিতায় রাজা শিবসিংহের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এটিও কবির প্রগাঢ় যৌবনেরই রচনা। কিন্তু এখানে কৃষ্ণপ্রেমের যে গভীরতম স্তরটিকে কবি রূপ দিয়েছেন তা স্থূল দেহক্ষুধাকে অতিক্রম করেছে। পরিপূর্ণ যৌবনোন্মাদনার দিনেও কবির মধ্যে দেহকামনা-অতিক্রমী প্রেমিক সত্তার যে উপস্থিতি ছিল এই পদটিই তার প্রমাণ। এই পদটি থেকে আমরা এও বুঝতে পারি, প্রার্থনা পদের পরম ভক্তিমান বিদ্যাপতির পরিবর্তন পরিণত বার্ধক্যের আকস্মিক পরিবর্তন নয়, এ তাঁর সত্তার অন্তর্লীন আর এক পরিচয়। ড. বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী*-তে 'কি কহবরে সখি ইহ দুখ ওর' শীর্ষক পদটিকে আক্ষেপানুরাগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাঁশীর শব্দ যেন বিষের মতো রাধার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যখনই কানে বাঁশীর শব্দ যাচ্ছে, তখনই রাধার 'বিপুল পুলকে পরিপূরএ দেহ'। কিন্তু গুরুজনের সামনে তাকে প্রকাশ করারও উপায় নেই। তাই রাধা 'যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ'। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষ্ণের বাঁশীর শব্দে রাধার শরীর অবশ হয়ে যায়, 'নিবি-বন্ধ' শিথিল হয়ে পড়ে। পদটিকে আমরা পুরোপুরি আক্ষেপানুরাগের পদ বলতে পারি না, কারণ বাঁশীর নিন্দা এখানে নেই বললেই চলে। তার বদলে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার প্রতিক্রিয়াই পদটিতে প্রধান হয়ে উঠেছে।

[ঘ]

পারস্পরিক অনুরাগের পরই মিলনের জন্য প্রয়োজন হয় অভিসারের। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনায় অভিসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। বিদ্যাপতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পূর্ববর্তী কবি। তাই অভিসারের সমুচ্চ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ হয়তো তাঁর পদে নেই, কিন্তু এও ঠিক যে, তিনি প্রকৃত জীবন-শিল্পী। তাই অভিসারের অন্তর্নিহিত প্রবল প্রাণশক্তিকে তিনি তাঁর পদগুলির মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। প্রেমিকা নারীর তীব্র কামনাবহ্নি এবং সেই কামনার অন্তরালবর্তী গভীর প্রেম— দুই-ই বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে বিদ্যাপতির পদে। তবে এই অভিসারের পদেও নাগরিক-কবি বিদ্যাপতির পরিচয় প্রকাশিত। এখানেও তিনি হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির সংযোগ ঘটিয়েছেন। অভিসারিকা রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন হয় যমুনার অপর পারে সংকেতকুঞ্জে।

Scanned with CamScanner

এপারে মিলিত হওয়ার কোন উপায় নেই। কারণ 'পূরল পুর পুরজন পিসুনে'। নগরীতে মানুষের এবং ছিদ্রান্বেষীর অভাব নেই। তাই রাধা নানা ইংগিতে কৃষ্ণকে অভিসারের সময় জানিয়ে দেন। নায়িকার এই চাতুর্য কৃষ্ণের প্রেমকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অভিসারের পদে বিদ্যাপতি কখনো কখনো সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্বিচার দাসত্বও করেছেন। অভিসারিকার দুর্জয় প্রেম, তীব্র উৎকণ্ঠা ও প্রবল সাহসিকতার পরিবর্তে কিছু বাঁধা-ধরা উপমার সাহায্যে অভিসারিকা রাধার দেহ বর্ণনাতেই কবি বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। উদাহরণ হিসেবে 'কবির রাজহংস জিনি গামিনী' শীর্ষক পদটির কথা উল্লেখ করা যায়। পদটিতে কবি গতানুগতিক কতকগুলি উপমার সাহায্যে রাধার দেহের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। রাধার গতি হস্তী ও রাজহংসকেও হার মানায়। তাঁর শরীর হার মানায় বিদ্যুতের দণ্ড ও সোনার মঞ্জরীকে। কেশকলাপ মেঘ, অন্ধকার, চামর, ভ্রমর এবং শৈবালকে হার মানিয়ে দেয়। তাঁর ভ্রূ যেন কন্দর্পের ধনু, ভ্রমর এবং সাপিনীকেও হারিয়ে দেয়। রাধার ললাটের সৌন্দর্য অর্ধচন্দ্রকে পরাজিত করে। চোখও পদ্ম, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী এবং খঞ্জনকে জয় করে। নাসিকার সৌন্দর্য তিলফুলকে ও গরুড়ের চঞ্চুকে হারিয়ে দেয়। তাঁর কান শকুনীর কানের চেয়েও ভাল। রাধার মুখমণ্ডল সোনার দর্পণ, চাঁদ এবং কমলের সৌন্দর্যকে জয় করে। রাধার কণ্ঠের সৌন্দর্য শঙ্খকে হার মানিয়ে দেয়। তাঁর স্তনযুগল বেল, তাল, সোনার কলস, পাহাড় ও বাটিকে জয় করে। রাধার বাহু দু'টির সৌন্দর্য মৃণাল, পাশ ও লতাকে এবং তাঁর কটিদেশের সৌন্দর্য ডমরু ও সিংহকে হারিয়ে দেয়। তাঁর লোমলতাগুচ্ছ শৈবাল এবং কজ্জলকে, ত্রিবলীর শোভা নদীর শোভাকে, নাভি সরোবরের পদ্মকে এবং নিতম্ব হস্তিকুম্ভকে জয় করে। এছাড়াও তাঁর হস্ত-পদের সৌন্দর্য স্থলকমলকে হার মানায়। নখর করকবীজ, চন্দ্র ও রত্নকে হার মানায়। তাঁর বচন কোকিল ও অমৃতকে হারিয়ে দেয়। পদটিতে অভিসারিকা রাধার মানসিক অবস্থার বর্ণনা বিন্দুমাত্র নেই। তাই অভিসারের পদ হিসেবে এ জাতীয় পদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

কিন্তু বিদ্যাপতির বেশিরভাগ পদেই প্রেমের দুর্বার আবেগে রাধা শেষ পর্যন্ত অসীম-সাহসিকা। অবশ্য এই অবস্থায় এসে পৌঁছতে রাধাকে অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে রাধা অভিসারে অনিচ্ছুক, ভীতা বালিকা মাত্র। দূতীর উক্তি থেকেই একথা জানা যায়। বালিকা রাধা অনভিজ্ঞা, তাই কৃষ্ণ সান্নিধ্যে আসার জন্য সে দুর্গম কণ্টকময় পথ অতিক্রম করতে উৎসাহী নয়। এই রাধা নিতান্তই বালিকা। সখী বা দূতী রাধাকে অভিসারে যেতে নির্দেশ দেন। এমনকি পূর্ণিমা-রাত্রির পটভূমিতে রাধাকে কি ধরনের বেশ-ভূষা করতে হবে তাও সখীই বলে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্যাপতির রাধা প্রেমের পরিণত অবস্থায় এই আপাত অনিচ্ছাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। অভিসারের পদে বিদ্যাপতি জয়দেবসহ অন্যান্য পূর্বসূরিদের ঋণ গ্রহণ করেও স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পেরেছেন। জয়দেবের কাব্যে অভিসারের বর্ণনা আছে, কিন্তু অভিসার-পথের প্রতিকূলতা নেই। অভিসারের প্রাণাবেগ সেখানে অতিললিত শব্দ-ঝংকারে বিলুপ্ত। কিন্তু অভিসারের ভেতর দিয়ে যে দৃঢ় সংকল্প, অকল্পনীয় দুঃসাহস এবং অদম্য মনোবলের প্রকাশ ঘটে তাকে ললিত শব্দ বিস্তারের কোমল লাবণ্যে প্রকাশ করা যায় না। তাই জয়দেব যেখানে ব্যর্থ, সেখানে বিদ্যাপতির সিদ্ধি।

বিদ্যাপতির অভিসার পর্যায়ের পদকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। কিছু পদে অভিসারের পূর্ববর্তী পর্যায়ের বর্ণনা, কিছু পদে আছে রাধার তীব্র আত্মদ্বন্দ্ব। শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব দূরীকরণেই সখী বা দূতী সহায়তা করেছে। আর এক শ্রেণীর পদে আছে কেবল অভিসারিকার আলঙ্কারিক বর্ণনা। কিছু পদে আছে দুর্গম পথের ভয়ঙ্কর-সুন্দর চিত্র। অন্য ধরনের কিছু পদে অভিসারের

পরবর্তীকালে রাধার পরিজনদের সংশয় এবং সংকেত-কুঞ্জে গিয়ে ব্যর্থ অভিসারিকার অভিমান-ক্ষুব্ধ বেদনা বর্ণিত হয়েছে। অভিসারের পটভূমি হিসেবে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনায় বিদ্যাপতির শিল্প-সিদ্ধি তর্কাতীত। 'আএল পাউস নিবিড় অন্ধার' শীর্ষক পদটিতে এই ধরনের প্রাকৃতিক পটভূমি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এখনো রাধার মনে দ্বিধা আছে, তাই তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবছেন। বর্ষা এল, ঘন অন্ধকার, মেঘ প্রবলভাবে বারিধারা বর্ষণ করছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পথ চলতে পথিকের মন ভেঙে যায়। রাধা ভাবছেন, কিভাবে তাঁর প্রিয় তাঁর কাছে আসবেন। তিনি নিজেও পথে এগিয়ে যেতে পারছেন না। কারণ গুরুজনদের ঘর থেকে শোবার ঘরে যেতেও বধূজনের ভয় হয়। নদীর স্রোত প্রবল এবং নদীও অথৈ। আবার পথেও চলেছে ভয়ঙ্কর সাপ। 'নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুজঙ্গম' শীর্ষক পদটিতেও তীব্র প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার চিত্র। কিন্তু এবার আর রাধা সেই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে ভয় করেননি। সখী রাধার সেই অভিসার যাত্রার দুঃসাহস কৃষ্ণের কাছে বর্ণনা করেছেন। রাত্রে নিশাচরেরা ঘুরছে। ভীষণ সাপ। আকাশে মেঘ গর্জন করছে। যমুনা নদীও দুস্তর। কিন্তু সেই দুস্তর যমুনাকে রাধা সাঁতার কেটে পেরিয়ে এলেন। পথে কত দুর্জন, কত প্রহরী। প্রেমের শত্রু কত মানুষ। কিন্তু যুবতী-শ্রেষ্ঠ রাধা কাউকেই ভয় করেননি।

'নব অনুরাগিণী রাধা' শীর্ষক পদটিতেও নবানুরাগের তীব্রতা নিয়ে রাধা একাই পথে বেরিয়েছেন। তিনি কোন বাধাকেই মানেন না। পথ-বিপথও মানেন না। মণিময় হার তিনি পরিত্যাগ করেছেন। উচ্চ কুচকেও তাঁর ভার মনে হতে থাকে। হাত থেকে কঙ্কণ, অঙ্গুরী সমস্তই পথে ত্যাগ করেছেন। পায়ের মণিময় মঞ্জরীকেও তিনি দূরেই ত্যাগ করে চলে যান। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। কিন্তু প্রেমের দেবতা মদন হৃদয়ে উজ্জ্বল। পথে বিঘ্ন ছড়ানো। কিন্তু প্রেমের অস্ত্রে রাধা সব বিঘ্নকেই ছেদন করলেন। পদটির প্রথম পংক্তিতেই রাধাকে 'নব অনুরাগিণী' বলা হয়েছে। নবীন প্রেমের প্রবল তীব্র আবেগে এবং অনাস্বাদিতপূর্ব মিলনের আনন্দলাভে রাধার অভিসার যাত্রা কোন বাধাকেই বাধা বলে গ্রাহ্য করেনি। অভিসার যাত্রার দৃঢ় একমুখী সংকল্পের মুখে দাঁড়িয়ে রাধা সব কিছুই ত্যাগ করেছেন। তখন তাঁর কাছে প্রেমের সত্যই জীবনের চূড়ান্ত সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। বাইরের অন্ধকার বিদ্যাপতির রাধার অভিসার যাত্রার পথে কোন বাধাই তৈরি করতে পারেনি। প্রেমের আলোতেই সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়েছে।

'মাধব করিঅ সুমুখি সাবধানে' শীর্ষক পদটিতেও দূতী বা সখীই কৃষ্ণকে বলেছেন, কৃষ্ণ যেন সুমুখী রাধার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তাঁর কাছে অভিসারে যেতে রাধা যত কষ্ট করেছেন, অন্য কোন কামিনী তা করতে পারত না। মেঘ থেকে জল ঝরে পড়ছে। পৃথিবী জলে ঘন, রাত্রি ভয়ঙ্কর, তবুও রাধা কেবল মাত্র কৃষ্ণের গুণের কথা মনে করেই অভিসারের পথে এগিয়ে গেছেন। তাঁর সাহসের সীমা নেই। ঘরের দেওয়ালে আঁকা সাপ দেখলেও ভয় পান যে রাধা, সেই রাধা সাপের মাথার মণি হাত দিয়ে ঢাকলেন ও হাসি মুখে কৃষ্ণের কাছে এলেন। নিজের স্বামীকে ছেড়ে বিষম নদী সাঁতরে এবং শ্রেষ্ঠ কুলের কলঙ্ক অঙ্গীকার করে কৃষ্ণানুরাগে মত্তা রাধা কিছুই মানলেন না। আবার 'রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম' শীর্ষক পদটিতে রাধা সখীকে বলছেন, রাত্রি যেন কাজল বমন করছে। পথে ভয়ঙ্কর সাপ। দুর্বার বজ্রপাত হচ্ছে। মেঘের গর্জনে মন ত্রস্ত। মেঘ যেন ক্রুদ্ধ হয়ে অবিরল জলধারা বর্ষণ করছে। অভিসারের পথে সংশয় তৈরি হল। কিন্তু রাধা সখীর কাছে বলছেন যে, কৃষ্ণকে তিনি কথা দিয়েছেন। তাই পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সমস্ত মেনে নিয়েই তিনি আজ নিজেকে সাহসী করে তুলবেন।

Scanned with CamScanner

পথে যেতেও তাঁর ভালো হবে না এটাও রাধা বুঝেছেন। কিন্তু তা হলে তো প্রেম পরাজিত হবে। সখীকে এই কথা বলে রাধা অভিসারে বেরিয়ে পড়েছেন। পথ তাঁর চেনা হেঁটে করেছে। রাধা তা মধ্যরাতে হবেই জেনেছেন, যাতে তাতে নূপুরের শব্দ হবে না। অভিসারিকা রাধার এই শব্দহীন কুসময়ে ইঙ্গিত কবি প্রেমের সীমা কতদূর তা জানতে চেয়েছেন।

বর্ষাঋতু প্রেমিক-প্রেমিকার মনে বিরহ-বিধুর বেদনাকে উজ্জ্বল করে তোলে। অভিসারের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম-পথ। বর্ষাঋতুর প্রতিকূল প্রকৃতি বিরহিণী অভিসারিকাকে সমাজের চোখে সহজে দৃষ্টি এড়িয়ে প্রিয়মিলনের সুযোগ করে দেয়। এই দুরন্তবর্ষিণী প্রকৃতি তাই অভিসারিকার প্রেম-সহায়িকা বন্ধু। এই কারণেই বিদ্যাপতির একটি পদে অভিসারিকা রাধা বলেছেন— 'সাওন মাহ ঘন ঘন বরিখত রীত। যব অভিসর অভিসারক রীত।। — কোটি রতন জলধর তোহে লেহ আবুত মাহি মণ তম বধ রহে।' তাই রাধা শ্রাবণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান। আর মেঘকে জ্যোতিষ্কের প্রয়োজন যেমন তেমনি এ শ্রাবণ-রজনীর নিবিড় অন্ধকারে নির্ভরতর করে তোলে। এখানে মেঘদূতের বিরহোন্মাদ যক্ষের মতো রাধাও প্রেমোন্মাদিনী। যক্ষ মেঘকে সজীব ভেবে তাকে দিয়েই প্রিয়ার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিল। আর রাধা মেঘকে অবের প্রয়োজন মেটাবার কৌতুক করতে চেয়েছেন। দুর্গম পথাতিক্রমণের পর রাধা কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের কষ্টের কথা বলছেন। মেঘ ঘন ঘন গর্জন করছে। বৃষ্টিও হচ্ছে। দশদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পথ-বিপথ কেউ চিনতে পারছে না। রাধা বলেছেন আজ তিনি মাধবের কাছে বড় কষ্টে এসেছেন। সুখের জন্য এসেও পথ মধ্যের দুঃখে তাঁকে বড় কষ্ট পেতে হয়। কণ্টকিত পঙ্কময় পথ রাধা বড় দুঃখে অতিক্রম করেছেন। মাধবের ওপর মেঘ বারিবর্ষণ করছে। যত দুঃখ রাধা পেয়েছেন তা কার কাছে বলবেন। নারীর লোভে রাধা দুঃখের পথ অতিক্রম করেছেন। বহু ভাগ্যে তাঁর প্রাণ বাঁচল, এখন কৃষ্ণের মুখ দেখে রাধা সব দুঃখ ভুলে গেছেন। সম্ভবত পরবর্তীকালে গোবিন্দদাস এই পদটিকেই প্রেরণার উৎস মনে করে 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট' শীর্ষক পদটি রচনা করেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে আছে সাধিকার আত্মবিস্মৃতি, আর পূর্বসূরি বিদ্যাপতির রাধা নিজের দুঃখসাধন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তবুও তিনি প্রেমিকা। তাঁর কৃষ্ণপ্রাপ্তি-জনিত বিপুল প্রেমের দুঃখ-গ্লানির বেদনা পদের শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'হেরইতে তুমুখ বিসরল সব দুখ এ দেহ আছ জানি নাগি'। কিন্তু অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে এই 'রাধা আত্মসচেতন, সতর্ক ও লাভালাভ বিষয়ে বাস্তববোধসম্পন্ন।'

বর্ষাভিসার ছাড়া বিদ্যাপতি রাধার জ্যোৎস্নাভিসার এবং দিবাভিসারের কিছু পদও রচনা করেছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাকুল আগ্রহে কখনো কখনো রাধা মেঘাচ্ছন্ন দিনকেই রাত্রি ভেবে অভিসারে বেরিয়ে পড়েন। বসন্ত রাত্রিতেও রাধার অভিসারের প্রসঙ্গ আছে। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ যুগী রাত্রিতে অভিসারের প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাধার পথে যেতে না পারার সঙ্কট পদটিতে বর্ণিত হয়েছে। কখনো বা বিদ্যাপতির রাধা পুরুষের ছদ্মবেশে অভিসারে বেরিয়েছেন। পরবর্তীকালে সুবলের ছদ্মবেশে কৃষ্ণের কাছে রাধার যাবার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে যদুনন্দনের পদে।

কিন্তু নিঃসন্দেহে অভিসার পর্যায়ের সবচেয়ে রসোত্তীর্ণ পদগুলি হল, বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রির। নায়িকার ঐকান্তিকতার ও মানসিক শক্তি পরীক্ষার সবচেয়ে বড় সুযোগ এখানেই। সমস্যের দুস্তর কঠিন বাধা যেমন সমুদ্রগামিনী নদীতে প্রবল গতির সঞ্চার করে, ঠিক তেমনিভাবেই বাধা-বিঘ্ন যত প্রবল হয়, পথ যত দুর্গম হয়, ততই তাকে অগ্রাহ্য করে, অতিক্রম করে, প্রেমের বিপুল শক্তিপ্রবৃত্তির আগ্রহ প্রেমিকার মনে জেগে ওঠে। প্রেম যে কি অসাধ্য

সাধন করতে পারে, কামনার ঐকান্তিকতা যে কি বিপুল শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে বিদ্যাপতির এই পদগুলি তার প্রমাণ। কৃষ্ণের অভিসার নিয়েও বিদ্যাপতি দু-একটি পদ রচনা করেছেন। যেমন 'রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী' শীর্ষক পদে দেখি মেঘান্ধকার রাত্রিতে কৃষ্ণ রাধার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। অপেক্ষারত কৃষ্ণের উৎকণ্ঠাই হয়ে উঠেছে পদটির প্রধান আকর্ষণ। তিনি ভাবছেন, রাত্রি ছোট। রমণী অতিশয় ভীরু। কতক্ষণে সেই গজগামিনী এসে পৌঁছতে পারবেন! একে তো পথে কত ভয়ঙ্কর সাপ রয়েছে। এছাড়া আরো কতই না সঙ্কট আছে। আবার তার পা-দুখানি কোমল। তাই বিধাতার কাছে প্রেমিক কৃষ্ণের মিনতি, নির্বিঘ্নে যেন সুন্দরী অভিসার করতে পারে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পৃথিবী জলমগ্ন। বিদ্যুৎ যেন চারদিকে ছড়ানো আছে। দশ দিক ঘন অন্ধকার। চলতে গেলে পা পিছলে যায়। পথ দেখা যায় না। সেই নারী কি এ-সবই ভুলে গেল! এ-সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যদি সে আসে, তা হলে জানতে হবে মিলনের জন্য সে লোভার্ত হয়েছে। পদটিকে কেউ কেউ অভিসার পর্যায়ভুক্ত করতে রাজি নন। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির অভিসারিকার সংজ্ঞায় বলেছেন—যিনি নিজে শুধু অভিসার করেন না, কান্তকেও অভিসার করান তিনিও অভিসারিকা। এই পদটিতে প্রেমিকই প্রেমিকার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অর্থাৎ তিনিই আগে অভিসার যাত্রা করেছেন। সুতরাং কৃষ্ণের অভিসার নিয়ে বিদ্যাপতির এ-জাতীয় দু-একটি পদকেও আমরা নিঃসংশয়ে অভিসারের পদ হিসেবেই গণ্য করতে পারি। তবে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অভিসারিকা রাধার প্রতিই বিদ্যাপতির মনোযোগ অনেক বেশি। বিদ্যাপতির বিঘ্নবিজয়িনী রাধার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই যে, তিনি রসশাস্ত্রের অনুগামিনী নায়িকা, পরবর্তীকালের মহাভাবময়ী নন।

[ছ]

বিদ্যাপতির পদাবলীতে নিতান্ত অল্প হলেও নৌকালীলার কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। সেই পদগুলিতে এক রূপলিপ্সু যুবক ও আশঙ্কাগ্রস্তা যুবতীর চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে। কখনো ভণিতায় বিদ্যাপতি জোর করে রাধাকে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু পদগুলির রসাবেদন অযাচিতভাবে খণ্ডিত করেছে। সুস্পষ্টভাবেই পদগুলি আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয়। কবি বিদ্যাপতি এবং বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা যে একই উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছে এটি তার অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভার নাগরিক রুচিকে চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর নৌকালীলার পদে গ্রাম্য-স্থূলতা নেই। মাত্র দু-একটি পদে নৌকালীলার বর্ণনা আছে। অন্যদিকে বড়ু চণ্ডীদাসের সামনে শ্রোতারা ছিল পল্লী-বাংলার অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষ। তাই তাঁর কাব্যে দানখণ্ড আর নৌকাখণ্ডের স্থূলতা বিস্তীর্ণ পরিসর জুড়ে রয়েছে। দানলীলার উল্লেখ বিদ্যাপতির পদে নেই। কিন্তু দু-একটি পদ পড়ে মনে হয়, এগুলি দানলীলার ইঙ্গিতবহ।

[জ]

বিদ্যাপতির মান পর্যায়ে 'বাসকসজ্জিকা' ও 'খণ্ডিতা' নায়িকা রাধা জয়দেবের নায়িকার কথাই মনে করিয়ে দেয়। রাধা সারা রাত্রি বিফল প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন। পরে রাত্রি-শেষে অন্য নায়িকাকে উপভোগ করে কৃষ্ণ তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন বিদ্যাপতির নায়িকা বিদ্রূপ তিরস্কার করে জয়দেবের রাধার মতোই নির্মমভাবেই বলেন, 'জাই রমণীসঙ্গে রয়নি গমওলহ।

অন্য নায়িকার তুলনায় বিদ্যাপতির পদে বর্ণিত রাধার কৌতূহলবোধ অনেক বেশি আছে।' অন্য নায়িকার মধ্যে বিহারকালীন অন্য এক অভিজ্ঞতা প্রকৃতিতে লক্ষণীয়। জয়দেবের বর্ণিত রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে বিহারকালীন তাঁর অনুরূপ একটি উক্তি করেন। একথা বলেছেন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর বিরহিণী রাধার তার অনুরূপ একটি উক্তিতে বলেন, 'কামিনী এড়ি কোথায় গেলা'। আবার অন্যত্র বলেন, অভিসারে বিদ্যাপতির রাধা বলেন, কৃষ্ণ 'কালিনী এড়ি কেবল গেলা'। আবার অন্যত্র বলেন, ... কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে মুগ্ধ'। এই সম্ভোগপর্বের নায়িকা ... কিন্তু রাধার কাছে নিজের অন্য নায়িকা-বিলাস প্রকাশিত উপভোগের কথা বলেই মনে হয়। কিন্তু রাধার কাছে নিজের অন্য নায়িকা-বিলাস প্রকাশিত হলে বিদ্যাপতির কৃষ্ণ বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন না। বরং তিনি রাধার তিরস্কারের উত্তরে বিদ্যাপতির কৃষ্ণ বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন না। বরং তিনি রাধার তিরস্কারের উত্তর দেন যে সর্বজনের কাছে, সকলের বিনোদন করার জন্যই তাঁর শরীর মলিন হয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই অভিমান অন্যায় এবং পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবিদের অনুসারী হলেও কৃষ্ণের পূর্ববর্তীদের এবং আমাদের প্রতি বরং রাধার সুগভীর প্রেমের বেদনাময় নিতান্ত স্বাভাবিক নয়। মালাধরবসুর কৃষ্ণকে রাধা প্রথম কম বলেছিলেন, কারণ কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ ছিল, তিনি যোড়শ-শত গোপিনীর মধ্যে রাধাকে শ্যামলী করলেন। কৃষ্ণের এই ধরনের প্রতিপক্ষ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ কেমন দেখা যায় না, তেমনি জ্ঞানদাসের পদাবলী সাহিত্যেও দেখা যায় না। বিদ্যাপতির রূপ বিশেষ লক্ষ্যণীয় এখানে বর্ণিত। যদি কখনো দেখে রাধার কৃষ্ণকে ভালবাসার এই শক্তি তাকে লৌকিক নায়িকা হিসেবেও নিতান্ত সাধারণ সুখ-দুঃখ মানবীতে পরিণত করেছে। তবে অভিমানী রাধার নীরব বেদনার প্রকাশও কবি আন্তরিকভাবেই প্রকাশ করেছেন। রাধা আক্ষেপ করে বলেন, কৃষ্ণের প্রেম যেন আকস্মিক ফুল। রাধা না দেখে তারই মধ্যে নীল দিয়েছেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধার অভিমান মাঝে মাঝে তীব্র ও নির্মম হয়ে ওঠে। কিন্তু রাধার বাক্য যত তীক্ষ্ণ হোক, আচরণ যত নিষ্ঠুর হোক না কেন, এর পেছনে অপমানিত অভিমানিনী নারী-হৃদয়ের বেদনাই বড় হয়ে উঠেছে। পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহ-চেতনা বিদ্যাপতির পদেও দীপ্ত শিখার উজ্জ্বল। তবুও মিথিলার রাজসভার বহু অভিজাত নারী-হৃদয়ের যে বঞ্চনার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ বিদ্যাপতির ঘটেছিল, তারই ছায়া পড়েছে এখানে।

[৪]

এরপর মানান্তে মিলন। এখন রাধা আর মুগ্ধা নায়িকা নন। এখন তিনি দেহে ও মনে পূর্ণ যুবতী। তাই কৃষ্ণ আলিঙ্গন প্রার্থনা করলে 'তোমারে সুন্দরি তনু অনি হাত'। কিন্তু মানান্তে মিলন প্রেমের পরিপূর্ণ স্বরূপ। অবশ্য আগে অনিচ্ছুক অনভিজ্ঞা নায়িকার মধ্যেও কৃষ্ণের মিলন বাসনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে দূতী এবং কৃষ্ণকেও সংযোগিতাভাবে আচরণীয় সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। এভাবে বিদ্যাপতি তাঁর মিলনের পদে নর-নারীর বিচিত্র প্রেমবিলাসকে অনবদ্য উজ্জ্বলে রসিকজনের মনোহারী করে তুলেছেন। তাঁর মিলনের পদাবলি যেন ভোগবিলাসী রাজপুরুষদের আভিজাত্য আবাসনের রত্ন-উজ্জ্বল মণি-মুক্তা খচিত স্বর্ণ-ভূষার।

[৫]

মিলনের এই প্রথম উন্মাদনের পর আসে বিচ্ছেদের অপ্রতিহত সুরের। প্রেমের গৌরব, মিলনের উচ্ছ্বাস, দেহের আবেগে মধুময় মনের অপরাজিত আবরণ যে উজ্জ্বল, বিরহ যেমন প্রতিশ্রুতি থেকে স্তরে স্তরে শেষ পর্যন্ত গভীর সর্বান্তিক গভীরতার মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। বিদ্যাপতির বিরহের পদে দেখলাম সেই মহা-গভীরের বর্ণনা। নরনারীর প্রেম

মিলন সত্তার পরিপূর্ণতারই রূপ। তাই উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে প্রিয়া কর্তৃক আলিঙ্গিত ও সুপ্তের তুলনা করেছেন। বিরহে তাই পূর্ণতা বিচ্ছিন্ন সত্তার রক্তাক্ত আর্ত ক্রন্দনের আর্তি এক আত্মার আর্তনাদ। বিদ্যাপতি তাঁর বিরহের পদকে সেই গভীরতাকেই নিয়ে যেতে পেরেছেন।

কিন্তু বিদ্যাপতির বিরহ পর্যায়েরও নানা স্তর বিভাগ আছে। প্রথম স্তরে রাধার মধ্যে পরিপূর্ণ দেহ কামনার প্রকাশ। তিনি বলেন, যখন যৌবন ছিল তখন তিনি কৃষ্ণের আদর পেয়েছেন। এখন যৌবন আর না থাকার জন্যই কৃষ্ণ তাঁর সমাদর করেন না। বিদ্যাপতির রাধা এখানে সম্পূর্ণভাবেই রক্তমাংসের মানবী। লৌকিক নায়িকার নিতান্ত সাধারণ আচরণই তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়। বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকৃষ্ণলীলার কেন্দ্রস্থলে যে রাধা চরিত্রটিকে রেখেছেন, তিনি সাধারণ নবযৌবনা এক তরুণী। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভালবাসার পূর্বসংস্কার কিছু নেই। তিনি নিতান্তই দেহের আবেগে যৌবনের সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী কৃষ্ণকে ভালবেসেছেন। তাঁর ভালবাসায় তাই পার্থিব প্রেমের মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু এই রাধাই রক্তস্রোতে মধুযামিনী যাপনের পর মানে-অভিমানে আবেগে-অনুরাগে উদ্বেল কামনাময় ভালবাসার নানা স্তর পেরিয়ে যখন মাথুর পর্যায়ে এসে উপনীত হন, তখন তাঁকে দেখা যায় আর এক মূর্তিতে। কৃষ্ণের বিরহ শেষ পর্যন্ত এই রাধাকে শান্ত নম্র সৌন্দর্যের ও সর্বাতিগ প্রেমের অধিকারিণী করে তুলেছে।

অন্যান্য পর্যায়ের মতো বিরহ পর্যায়েও বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা মর্ত্যজীবনের রক্তমাংসে গড়িত মানুষেরই প্রেমগাথা। পার্থিব সৌন্দর্যকে অবলম্বন করেই এখানে তিনি অপার্থিব লোকে যাত্রা করেছেন। অনুভবের এই জগৎকে আমরা বলি অলৌকিক, আধ্যাত্মিক। কিন্তু এই অলৌকিক আসলে লৌকিক জীবনেরই পরম অনুভবের দুর্লভ মুহূর্ত। আধ্যাত্মিকতা আসলে মানুষের চেতনারই সম্প্রতি। এদিক দিয়ে বিদ্যাপতির ওপর কালিদাসেরও কিছু প্রভাব আছে বলা যায়। কালিদাসের কাব্য-নাটকেও দুঃখ বেদনার অগ্নিদহনে বদ্ধ নায়ক-নায়িকা দেহনিরোচ্ছল যৌবন-সুরাপানের মাদকতাকে অতিক্রম করে একান্তভাবে স্নিগ্ধ শান্তিময় লাবণ্যের অধিকারী হয়েছে। বিদ্যাপতির রাধা চরিত্রটিও একই পরিণতি লাভ করেছে। এমনকি বিদ্যাপতি প্রত্যক্ষভাবেই কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকের বিরহী পুরূরবাকে নিয়ে একটি পদ রচনা করেছেন। এছাড়াও তাঁর রাধা সংস্কৃতকাব্যের বিরহিণী নায়িকা এবং জয়দেবের রাধার মতোই শীতল চন্দন ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন।

বিদ্যাপতির বিরহিণী রাধার মানস পরিবর্তনের স্তরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে দেখা যায় কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধার কাতরতা কৃষ্ণের অভাবে ভোগ-বিলাসের অপূর্ণতার জন্যই। কোকিলকূজিত পুষ্পময় বসন্তে সখীকে সম্বোধন করে রাধা বলেন, এই বসন্তকালই কৃষ্ণের সঙ্গে বিলাসের উপযুক্ত সময়। আবার রাধা খেদ করেন, তাঁর প্রথম বয়স কিন্তু সাধ পূর্ণ হল না। কৃষ্ণ বিনা দোষে কেন তাঁকে পরিত্যাগ করলেন তার কারণও রাধা খুঁজে পান না। 'অঙ্কুর-তপন তাপে যদি জারব' শীর্ষক পদটিতেও নবযৌবন বিরহে যাপন করতে হবে এই বেদনায় রাধা অধীর। এখানেও রাধার প্রেম দেহ নির্ভর। কিন্তু দেহ কামনার স্পর্শ কিছুটা থাকলেও সেই সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকৃত উপলব্ধি এখানে বিরহিণী রাধার প্রেমে দেহাতীত লাবণ্য সঞ্চার করেছে। দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায়, ভোগের আগুন অনেকখানি নির্বাপিত। কিন্তু এখনো রাধা কৃষ্ণের প্রেমের কোন মহিমাই স্বীকার করেন না। বরং বলেন—'যৌবন রতন আছল দিন চারি।/সে দেখি আদর কয়ল মুরারী' বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র পরিবেশে কৃষ্ণের বিরহে রাধার অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বসন্তের আগমনে রাধা তাঁর পূর্বের রসবিলাস স্মরণ করে বেদনার্ত হয়ে পড়েন। 'মরি যেও মধুপুর তান কুলবালা' শীর্ষক পদটিতে রাধা বিরহ বেদনার সঙ্গে সঙ্গে

নিজের রূপ-যৌবন সম্পর্কেও পরিপূর্ণভাবে সচেতন। তাই তিনি বলেন, কৃষ্ণ মথুরাপুরে চলে যাওয়ায় মালতীমালা যেন বিপথে পড়ল। মালতীমালার বিপথে পড়ার এই উপমাটি যেন রাজসভার একটি উৎসবমত্ত রাত্রির ক্লান্ত সমাপ্তিরও সূচক। বিলাসী প্রণয়ীর কণ্ঠে সযত্ন-রচিত পুষ্পমাল্য সারারাত্রির ভোগমত্ততার পর পথের ধূলায় নিক্ষিপ্ত হয়, রভসরজনী অবসানে রাধাও আজ ঠিক তেমনি ভাবেই পথের ধূলায় পরিত্যক্ত। কৃষ্ণের সঙ্গেই রাধার চোখের ঘুম, মুখের হাসি, আর মনের সুখ চলে গেছে। শুধু পড়ে আছে দুঃখ। বিরহিণী রাধার এই যে ম্লানমূর্তি কবি অঙ্কন করেছেন, তা আমাদের কালিদাসের যক্ষপ্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়।

বিরহের পরবর্তী স্তরে রাধার মধ্যে আর এই ভোগলুব্ধতা নেই। দীর্ঘ বিরহের শোকসজল দিনগুলির বিবশ প্রহর ক্রমশ কৃষ্ণের সান্নিধ্যটুকুকেই মূল্যবান করে দেয়। রাধার কাছে এখন 'নন্দপুরচন্দ্রহীন বৃন্দাবন অন্ধকার' মনে হয়। 'অব মথুরাপুর মাধব গেল' শীর্ষক পদটিতে রাধার সেই স্মৃতিভারপীড়িত বেদনাবিদীর্ণ সত্তার আর্ত হাহাকার 'গোকুল মাণিক কো হরি লেল।' নিরূপায়ভাবে এই বেদনাদহনকে বহন করেন যে রাধা, তিনি আমাদের এই পরিচিত সংসারেরই। যে সংসারে প্রতি মুহূর্তে প্রিয়জনের অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্ছেদের পর স্মৃতিভার নিয়ে পড়ে থাকা মানুষ শুধু সারাজীবন হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের কথা ভেবে চোখের জল ফেলে—রাধা তাদেরই একজন। এই রাধাকে কোন দেশকালের পরিধিতে আবদ্ধ করা যায় না। 'চির চন্দন উরে হার না দেলা' শীর্ষক পদটিতে রাধার হাহাকার আরও মর্মস্পর্শী, ক্রন্দন আরও তীব্র। নিবিড় প্রিয়-আলিঙ্গনের ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তে ভূষণ-প্রসাধনই যাঁর বাধা হয়ে উঠেছিল একদা, আজ নদী-গিরির পরপারবর্তী তাঁরই কথা ভেবে রাধা অন্তরের গভীরতম ক্ষত চিহ্নটিকে উন্মোচিত করেন—'আন অনুরাগে পিয়া আনদেশে গেলা।/পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।' প্রেমই রাধার জীবনের সর্বস্ব, তাঁর গৌরবও বটে। প্রিয়তমের অনুপস্থিতিতে গৌরবভ্রষ্টা রাধার বেদনাই এখানে অনুরণন তুলেছে। 'প্রেমক অঙ্কুর যাত আত ভেল' শীর্ষক পদটিতে রাধার আক্ষেপের বেদনাই ধ্বনিত হয়েছে। 'সজল নয়ন করি' শীর্ষক পদটিতে দেখা যায়, সখীর কাছে প্রিয়তম বিদেশে যাওয়ার জন্য রাধা আক্ষেপ করছেন—'কি মোর করম ফলে পিয়া গেল দেশান্তরে/নিতি নিতি মদনঝঙ্কার।' এখানেও বিরহিণী রাধার দেহকামনার প্রকাশ ঘটেছে। বিদ্যাপতির রাধা এই স্তরে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর এক কৃষ্ণপ্রেমিকার কথা ভেবে নিয়ে তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। আবার কখনো *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর রাধার মতো বলেছেন—'পাখিজাতি যদি হও পিয়াপাশে উড়ি যাও/সব দুখ কহোঁ তছু পাশে।'

পরবর্তী স্তরে বিরহের দশমী-দশায় দূতী মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে রাধার অবস্থা জানায়। এখন রাধার 'অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর/জনু ঘন সাওন ধারা।' রাধার সেই অনর্গল অশ্রুনীরে নদী বয়ে যায়—'লোচন নীরে তটিনী নিরমান'। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা এখন তাঁরই অশ্রুনীরে নির্মিত সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল। বিদ্যাপতির কবিকল্পনার এই চারুত্ব বিরহিণী রাধাকে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছে। রাধা এখন অবিরত কৃষ্ণনাম জপ করেন। কৃষ্ণের বিরহাগ্নিজ্বালা হৃদয়ে বহন করে রাধা যেন বৃন্দাবনে তপস্যা করছেন, আর তাতে আহুতি দেবেন নিজের শরীরকে। এ যেন *কুমারসম্ভব*-এর চন্দ্রশেখর বিরহিণী উমারই আর এক রূপ। রাধা এখানে জীবনকে ইন্ধন করে স্মৃতির দাহে আত্মাহুতি দান করেছেন। প্রেমের রাজ্যে প্রথমে প্রসাধন, পরে সাধনার শুচিতা— বিরহিণী রাধার প্রেমতপস্যা এই সত্যকেই প্রমাণ করে। এরপর দেখা যায়, রাধা 'হরি হরি বলি ধরণি ধরি লুঠই/সখি বোধে ন পাতয়ে কাণ।' এ কোন্ রাধা? কোথায় সেই বয়ঃসন্ধির যৌবন রসোচ্ছলা চটুলা বালিকা? এই রাধার একান্ত প্রেমতন্ময়তা মাধবের জন্য

নয়নক্ষরিত অনর্গল অশ্রু আর অবিরল হরিনাম জপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই হিরণ্যবর্ণ ভাবতন্ময় সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের কথা। চৈতন্যদেবের পদাবলীকারগণ শ্রীচৈতন্যের দিব্যপ্রেম প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতি কোথায় পেলেন এই কৃষ্ণপ্রেম তন্ময়া, কৃষ্ণনাম জপবিহ্বলা রাধাকে। আমরা বলব, তাঁর আপন কবিচেতনার মর্মলোক থেকে। যৌবনের মদমুকুলিত ভোগবিহ্বল দিনগুলিতে যিনি বয়ঃসন্ধির বালিকার লীলাচাপল্য এঁকেছেন, রূপ দিয়েছেন প্রথম সমাগমলুব্ধা রাধা ও কামনিপুণ কৃষ্ণকে, বারবার বর্ণনা করেছেন অসম্বৃতবাসা যুবতীর অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত কামোদ্দীপক বরতনু। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে সেই বিদ্যাপতিই রাজা ও রাজপরিবারের উত্থান-পতনের সাক্ষ্য নিজের জীবনে বহন করে শান্ত সমাহিত ভক্তির পরম সান্ত্বনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন মাধবের পায়ে। নিধুবনে রমণীরসরঙ্গের জ্বালাময় স্মৃতিতে বেদনামথিত কবিচিত্তের আন্তরিক উৎসারণ ঘটেছে বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদে। এই বিদ্যাপতির সঙ্গে আমরা তাঁর রাধাকে মিলিয়ে নিতে পারি। এইখানেই পূর্বসূরি জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির পার্থক্য। ইতিহাসের দৃষ্টিতে আমরা বলব উত্তরণ। অবশ্য বিরহ পর্যায়ে অনুভূতির এক গভীরতম স্তরে বিদ্যাপতির রাধা জয়দেবের রাধারই সগোত্রীয়া। জয়দেবের বিরহিণী রাধা সম্পর্ক সখী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলেছেন 'মৃদুবলোকিত মণ্ডনলীলা/মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা'। আর বিদ্যাপতির রাধা বলেছেন—'অনুখন মাধব মাধব সুমরিতে/সুন্দরী ভেলি মাধাই'। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমতন্ময়া যে রাধা বিদ্যাপতির ব্যক্তিক অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশে জীবন্ত সেই রাধাকে আমরা জয়দেবের কাব্যে পাই না। জয়দেবের রাধা এবং কবি নিজে পৃথক সত্তা। কিন্তু বিদ্যাপতির কাব্যে প্রার্থনার পদগুলিই প্রমাণ করে দেয় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যৌবন বয়সের ভোগোল্লাসের মাঝখানে যে ভক্তিরসপ্রবাহ প্রচ্ছন্ন ছিল তা শেষ জীবনে এসে শান্ত সমাহিত আত্মনিবেদনময় প্রার্থনার পদে পরিণতি লাভ করেছে। তেমনি পূর্বরাগ, মিলন ও অভিসারের কামনায় উদ্বেল রাধাও বিরহ পর্যায়ে এসে শান্ত নম্র মঙ্গলশ্রী লাভ করেছেন। নিপুণ নাট্যকারের মতো বিদ্যাপতি বেদনার অপরিমেয় অশ্রুজলে রাধার যৌবন-কামনার সমস্ত স্থূলতার আবর্জনা ধুইয়ে দিয়ে তাঁকে 'কৃষ্ণমুখৈক তাৎপর্যময়ী' করে তুলেছেন। এখন আর দেহমিলনের জন্য রাধা ব্যাকুল নন, একবার মাত্র কৃষ্ণের দেখা পেলে নয়ন ভরে তাঁর রূপসুধা পান করে রাধা প্রাণ ফিরে পাবেন। আজ বিরহ সাগরের অতল গভীরে রাধার কামনার অগ্নি নির্বাপিত। তাই বিদ্যাপতির বিচ্ছেদাতুরা রাধা প্রেমতাপসী পূজারিণী রাধায় পরিণত হয়েছেন।

[ঝ]

পরবর্তী 'ভাবোল্লাস' পর্যায়ের 'পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে' শীর্ষক পদটিতে আমরা এই পূজারিণী রাধারই সাক্ষাৎ পাই। রাধা কল্পনা করেছেন, কৃষ্ণ এলে নিজের অঙ্গ হবে পূজা-বেদী। এইভাবে রাধা যেন দেহদীপ জ্বালিয়ে কৃষ্ণের আরতি করবেন। পদটিকে মাথুরের শেষ এবং ভাবোল্লাসের সূচনা-পদ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ভাবলোকে কৃষ্ণের সঙ্গে আনন্দে উচ্ছলা রাধার চিত্রও কবি এঁকেছেন। এই ভাবোল্লাসের বর্ণনা জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এ অথবা বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ নেই। বিদ্যাপতির পদে এই বিরহিণী রাধা কল্পনা করেছেন কৃষ্ণ তাঁর কাছে ফিরে এসেছেন। ভাবসম্মিলন প্রকৃতপক্ষে বিরহ অবস্থারই একটি বিশিষ্ট মানসিক পর্যায়। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশা নিশ্ছিদ্র বিরহের অন্ধকারে খদ্যোতের মতো জ্বলতে জ্বলতে অকস্মাৎ বাসনায় অনুরূপ মিলনের চেতনাকে এমনভাবে বিস্ফারিত ক'রে তোলে, যেখানে বাস্তব মিলন নয়, কল্পনার মিলনই ভাবসৌন্দর্যে বাস্তব মিলনের সৌন্দর্যকে

Scanned with CamScanner

ছাড়িয়ে যায়। বিরহিণীর প্রেমতন্ময় অবস্থার এ-এক অপূর্ব মানস-বিকাশ। বিদ্যাপতির হাতে প্রেম-মনস্তত্ত্বের এই শিল্পিত রূপায়ণ সম্ভবত তার সৌন্দর্যের দাবিতেই উত্তরকালের বৈষ্ণব শাস্ত্রকারদেরও স্বীকৃতি আদায় করেছিল। কিন্তু সেই স্বীকৃতি অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলোকে বিরহোত্তর মিলনের যথার্থ্য প্রতিপাদী সম্ভোগ শৃঙ্গারের অন্তর্গত।

বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলনে আনন্দিতা রাধা বলেন 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ/ পেখলুঁ পিয়ামুখ চন্দা'। যে রাধার একদিন কৃষ্ণবিরহে মনে হয়েছিল 'শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি' তাঁর আনন্দের সীমা নেই। কারণ মাধব চিরদিনই তাঁর গৃহে অবস্থান করেছেন। তাঁর জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন কৃষ্ণ। এখানেও রাধার একাগ্র তন্ময় কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব ব্যাখ্যা ভাবসম্মেলনের পদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

[ঞ]

অবশেষে প্রার্থনার পদ। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদে রাধাকৃষ্ণলীলার বর্ণনা নেই। কবি কখনো তাঁর ইষ্টদেবতা শিবের কাছে, আবার কখনো বা মাধবের কাছে সকরুণভাবে নিজের ভোগক্লিষ্ট তাপদগ্ধ জীবনের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। কখনো বার্ধক্যজীর্ণ কবি তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে নিজের নারীলুব্ধতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করেছেন। যৌবনের ভোগপ্রমত্ত দিনগুলির অবসানে বার্ধক্যের অসামর্থ্যের প্রতি নিজেই ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। অনুতপ্ত কবি নিজের পাপকর্মও অকাতরে স্বীকার করে শিবের চরণে শরণাগতি প্রার্থনা করেছেন। মাধবের প্রতি নিবেদিত 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়' শীর্ষক পদটিতে কবির সেই অনুতাপ, আত্মনিবেদনের একান্ত আকূতি প্রকাশিত। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদেও ঈশ্বরের বিরাট রূপ এবং একই সঙ্গে তাঁর পরম কারুণিকরূপের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তিনি শৈব অথবা পঞ্চোপাসক সে তর্কে যাওয়ার আগে বলা যায়, এখানে তিনি সর্বদেবতার উর্ধ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা রূপেই মাধবের বন্দনা করেছেন। তাই পদটি থেকে তাঁকে কেউ কেউ পরমভাগবত বলে উল্লেখ করলেও আসলে তিনি শৈবই।

[ট]

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলীর সমীক্ষা থেকে আরও বোঝা যায়, বিদ্যাপতির শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর ব্যক্তিগত আসক্তিও যুক্ত হয়েছে। রূপদক্ষ কবি কখনো কখনো আলঙ্কারিক চাতুর্যকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন। এর কারণ ভক্তিতন্ময়তার পরিবর্তে রাজসভার রাজপুরুষদের মনোরঞ্জনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই প্রণয়ের বিচিত্র কুটিলরীতির ছবি ফুটিয়ে তোলাই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষার বিষয়। বিচিত্র অলঙ্কার ব্যবহার তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কখনো কখনো প্রবাদবাক্যে এবং সুভাষিত সহযোগে তাঁর পদাবলী দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলাকথার মধ্যে শুধু নয়, সমগ্র শিল্পী-ব্যক্তিত্বের মধ্যেই রাজমনোরঞ্জনের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভা-পরিবেশের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। কিন্তু এসবের উর্ধ্বেও বিদ্যাপতির বড় পরিচয় তিনি জীবনরসিক কবি। তাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে দেহকামনার উর্ধ্বলোকচারী মানুষের অন্তরতরসত্তার পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। তাঁর কাব্য যেন একদিকে রাজসভার অলঙ্কৃত ঐশ্বর্যের রত্নচ্ছটা, অন্যদিকে কবিমর্মের মৃণালে জীবনবেদনায় আন্দোলিত উর্ধ্বলোকগামী আলোকপিপাসু রক্তকমল। দেহ এবং দেহাতীত, মর্ত্য এবং অমর্ত্যের মিলন সম্পাদনে বিদ্যাপতি যেন মৃৎপ্রোথিত কৈলাসে চন্দ্রচূড়।

Scanned with CamScanner